বাংলাদেশের যোগাযোগ ও বাণিজ্য
(Transport and Trade of Bangladesh)

ইউনিট ১১

ভূমিকা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থার উপর। দেশের অভ্যন্তরে একস্থান হতে অন্যস্থানে অথবা একদেশ থেকে অন্যদেশে মালামাল ও জনগণের চলাচলের মাধ্যমকে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলে। দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের মাধ্যমসমূহ অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার অন্তর্গত এবং এক দেশের সাথে অন্যদেশের চলাচলের মাধ্যম আন্তর্জাতিক যাতায়াত ব্যবস্থার অন্তর্গত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমগুলো হলো স্থল, জল ও আকাশ পথ এবং আন্তর্জাতিক যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে আকাশ ও সমুদ্রপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১১.১ সড়ক পথ
পাঠ - ১১.২ রেল পথ
পাঠ - ১১.৩ নদীপথ
পাঠ - ১১.৪ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
পাঠ - ১১.৫ বৈদেশিক বাণিজ্য
পাঠ - ১১.৬ আমদানি ও রপ্তানি পণ্য

পাঠ-১১.১ সড়ক পথ(Road Transport)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের সড়কপথ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সড়কপথের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	পরিবহন ব্যবস্থা, সড়কপথ।

পরিবহন ব্যবস্থা

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা: স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ। স্থলপথ দুইপ্রকার ; যথা: সড়কপথ ও রেলপথ এবং জলপথ দুইপ্রকার নদীপথ ও সমুদ্র পথ।

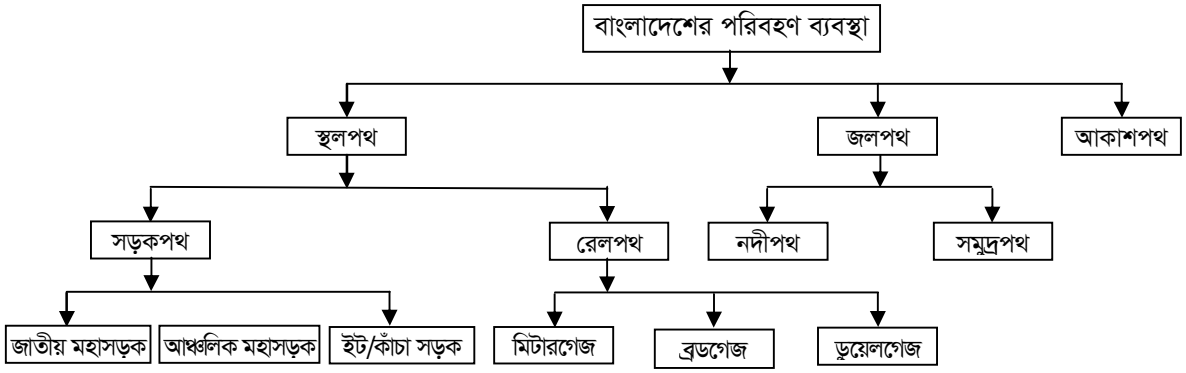

সড়ক পথ (Roads) : সড়কপথ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের অন্যতম অবকাঠামো। বসতির বিন্যাসের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের সড়কপথগুলো গড়ে উঠেছে (চিত্র- ১১.১.১)। অধিকাংশ সড়ক পথ রেলপথ ও নদীপথের পরিপূরক হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বন্টন, দ্রুত যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ২১,৪৫৪ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। মোট সড়কের মধ্যে ১৭ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬৩ শতাংশ ইট/কাঁচা সড়ক রয়েছে (সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর, ২০১৩)।

সড়কপথের শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের সড়ক পথগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ইট বা কাঁচা সড়ক (চিত্র- ১১.১.১)। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিভিন্ন শ্রেণির সড়কপথের পরিমাণ নিম্নের সারণি ১১.১.১ এ দেখানো হলো।

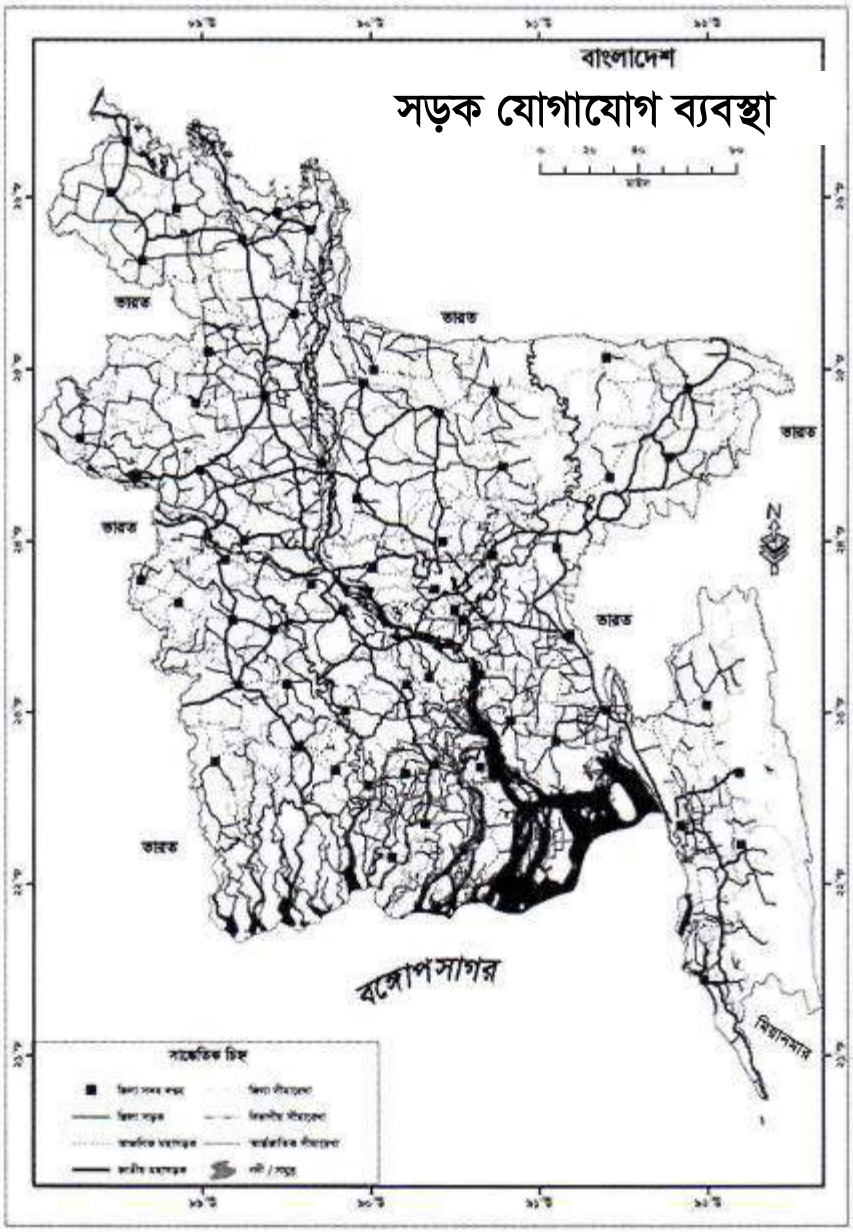

চিত্র ১১.১.১ বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা (সড়ক পথ)

সারণি-১১.১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শ্রেণির সড়কপথ

সাল / সড়কপথ	২০১১	২০১২	২০১৩
জতীয় মহাসড়ক (কি:মি:)	৩,৪৯২	৩,৫৭০	৩,৫৩৮
আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি:মি:)	৪,২৬৮	৪,৩২৩	৪,২৭৮
ইট বা কাঁচাসড়ক (কি:মি:)	১৩,২৮০	১৩,৬৩৮	১৩,৬৩৮
মোট	২১,০৪০	২১,৪৬২	২১,৪৫৪

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ (পৃ: ১৫৮)

অভ্যন্তরীণ প্রধান সড়কপথ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সড়কপথ মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক তাই প্রধান সড়কপথসমূহ নিম্নরূপ। যথা :

১. ঢাকা ↔ আরিচা নগরবাড়ি হয়ে পাবনা, বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর দিনাজপুর ও তেঁতুলিয়া।

২. ঢাকা ↔ দৌলতদিয়া হয়ে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল।

৩. ঢাকা ↔ টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।

৪. ঢাকা ↔ কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, টেকনাফ।

সড়কপথের বৈশিষ্ট্য

১. সমতলভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম বন্দর ও সিলেট অঞ্চলে অধিকাংশ সড়কপথ গড়ে উঠেছে।

২. উঁচু-নিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় সড়কপথ নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। একারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়ক পথ আছে কিন্তু কম।

৩. শক্ত মৃত্তিকা বা মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তাহলে সড়কপথ বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয় অর্থাৎ সড়কপথ স্থায়ী হয়।

৪. বাংলাদেশে বন্দর ও শিল্পক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সড়কপথ গড়ে উঠে। এজন্য মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও অন্যান্য শিল্প অঞ্চলে অধিকাংশ সড়কপথ গড়ে উঠেছে।

৫. ঢালযুক্ত স্থানে সড়কপথ তৈরি করা কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। এতে গাড়ির জ্বালানি খরচ বেশি হয়। অর্থাৎ বেশি ঢাল সড়কপথ তৈরির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ।

৬. বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ অঞ্চলে কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণে খরচ বেশি হয়। এজন্য এসকল অঞ্চলে সড়কপথ কম গড়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশের সিলেটের হাওর অঞ্চল বা দক্ষিণাঞ্চলে সড়কপথ কম।

৭. কাঁচা সড়ক ও আঞ্চলিক সড়কগুলো বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে বৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে সারাবছরই সড়ক মেরামত করতে হয়।

৮. বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করতে হয়, যা সড়ক পথের বাধা হিসাবে কাজ করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু এবং ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪, পৃ: ১৫৮)।

সড়কপথের গুরুত্ব :

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সড়কপথের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন-

১. **কৃষির উন্নয়ন :** কৃষির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সার, কৃষিপণ্য পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যসাধনে সড়কপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

২. **শিল্পের উন্নতি সাধন :** শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও জ্বালানি সংগ্রহ, শিল্পজাতদ্রব্য বাজারজাতকরণ অর্থাৎ শিল্পের বিনিয়োগ ও উৎপাদন বন্টন কাজে সহায়তা করে সড়কপথ শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করছে।

৩. **ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন :** বাংলাদেশের সর্বত্র ছোট-বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্র বা হাটবাজার রয়েছে। সড়কপথের মাধ্যমে সময়মত ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন করছে।

৪. **সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার কারণে দেশের সর্বত্র পণ্য বা মালামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

৫. **দ্রব্যমূল্যের সমতা :** শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা থাকলে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকবে না।

৬. **বনজ সম্পদ আহরণ :** সড়কপথ থাকায় বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা থেকে বনজসম্পদ আহরণ ও বিস্তরণ সহজসাধ্য হয়েছে।

৭. **গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ :** সড়কপথের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সুষম উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের সর্বত্র চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক কর্মকান্ড অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। উন্নত সড়ক ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা কমিয়ে আনবে।

সড়কপথের উন্নয়নের উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। অর্থাৎ যুগোপযোগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে প্রধান প্রধান অভ্যন্তরীণ সড়কপথগুলো চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরনের পরিবহন মাধ্যম রয়েছে যথা স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ। সড়কপথ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জন্য অন্যতম অবকাঠামো। বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ২১,৪৫৪ কিলোমিটার সড়কপথ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান তিন ধরনের সড়কপথ রয়েছে ; যথা জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক ও কাঁচা সড়ক। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সড়কপথ মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক। পার্বত্য এলাকায় বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য সড়কপথ কম অপরদিকে বন্দর ও শিল্পাঞ্চলে, সমতল ভূমি প্রবণ অঞ্চলে সড়কপথের সংখ্যা বেশি। নদীবিধৌত অঞ্চলে প্রধানত ফেরী, ব্রিজ, কালভার্টের মাধ্যমে সড়ক পথের যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। বাংলাদেশে ৪,৫০৭টি সেতু, ১৩,৭৫১টি কার্লভাট এবং ৩৪টি ফেরী রয়েছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য তথা সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়কপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের সড়ক পথের ক্ষেত্রে
নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ লক্ষ্য করুন-
i) সমতল ভূমি সড়ক পথ নিমার্ণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
ii) অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সড়কপথ মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক
iii) বাংলাদেশে মোট ২১,৪৫৪ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে
নিম্নের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i, ii ও iii ঘ) ii

২. বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

৩. বাংলাদেশের সড়ক পথের দৈর্ঘ্য কত?
ক. ২১,৪৫৪ কিলোমিটার খ. ২০,৪৫৪ কিলোমিটার
গ. ১৯,২২০ কিলোমিটার ঘ. ১৮,২২০ কিলোমিটার

৪. বাংলাদেশে ফেরিঘাটের সংখ্যা কত?
ক. ৩৪ টি খ. ৫০ টি
গ. ২০ টি ঘ. ১০ টি

৫. বাংলাদেশের সড়কপথ কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

পাঠ-১১.২ রেলপথ (Railways)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রেলপথের প্রকারভেদ করতে পারবেন;
- রেলপথের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- রেলপথের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	রেলপথ, ব্রডগেজ রেলপথ, মিটারগেজ রেলপথ।

রেলপথ

শিল্প ও কৃষিজ পণ্য পরিবহন, কাঁচামাল ও জনসাধারণের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, শ্রমিক স্থানান্তর, কর্মসংস্থান তথা বাংলাদেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রেলপথের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি দেশের প্রধান বন্দর, শহর, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রের সাথে সংযোগ সাধন করে থাকে (চিত্র : ১১.২.১)।

প্রকারভেদ : বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরনের রেলপথ রয়েছে। যথা:

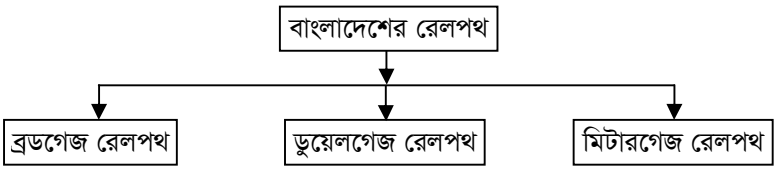

যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে একটি পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেললাইনের দৈর্ঘ্য ২,৮৭৭ কিলোমিটার। তন্মধ্যে-

ব্রডগেজ রেলপথ : ১.৬৮ মিটার প্রস্থ রেলপথকে ব্রডগেজ রেলপথ বলে। ব্রডগেজ রেলপথ যমুনা নদীর পশ্চিমাংশে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৬৫৯ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ রয়েছে।

ডুয়েলগেজ রেলপথ : বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে জামতৈল থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ৪১০ কিলোমিটার ডুয়েলগেজ রেলপথ রয়েছে।

মিটারগেজ রেলপথ : ১ মিটার প্রস্থ রেলপথকে মিটারগেজ রেলপথ বলে। মিটারগেজ রেলপথ যমুনা নদীর পূর্বাংশে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে রয়েছে। মিটারগেজ রেলপথের পরিমাণ ১,৮০৮ কিলোমিটার (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪, পৃ: ১৬৪)।

বাংলাদেশের রেলপথের বৈশিষ্ট্য

১. বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সমতল। এ কারণে এ দেশের পাহাড়ি, বনাঞ্চল ও জলাভূমি ছাড়া প্রায় সব স্থানেই রেলপথ নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক, কারণ এতে খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের প্রধান দুটি বন্দরকে (চট্টগ্রাম ও খুলনা) কেন্দ্র করে সমতল ভূমিতে রেলপথ গড়ে উঠেছে।

৩. নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে উঠেনা। কারণ মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ নির্মাণ কঠিন। এছাড়াও অধিক সংখ্যক ব্রিজ তৈরি করতে হয়। এজন্য বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম।

৪. বাংলাদেশের যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয়পাশে রেল লাইন স্থাপিত হওয়ায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার সরাসরি রেলযোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।
৫. বর্তমানে তিস্তামুখ ঘাট ও বাহাদুরাবাদ ঘাট এবং সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জের মধ্যে ২টি রেলওয়ে ফেরি চালু রয়েছে।
৬. ঢাকা থেকে বাংলাদেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে রেলযোগে যাতায়াত করা যায়।
৭. বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৪৩টি রেল স্টেশন রয়েছে (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক ২০১২/জুন ২০১৩, সারণি ৮.০১)। ঢাকার কমলাপুর দেশের বৃহত্তম রেল স্টেশন।

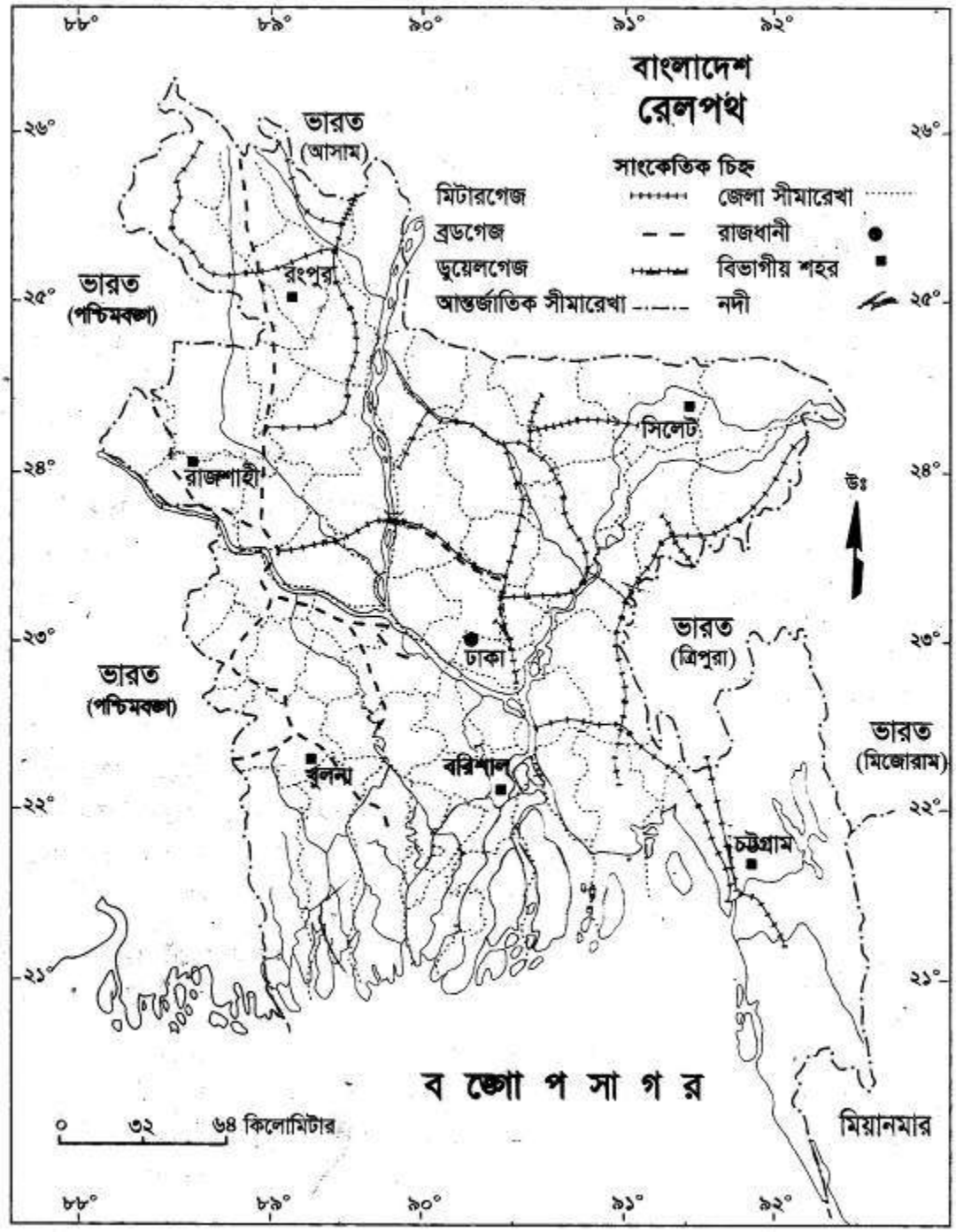

চিত্র ১১.২.১ বাংলাদেশের রেলপথ

রেলপথের গুরুত্ব

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে রেলপথের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যথা :

১. যাত্রী পরিবহন : নিরাপদ যাত্রী পরিবহনের জন্য রেলপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
২. পণ্য পরিবহন : বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের সাথে রেলপথের যোগাযোগ থাকায় কৃষিজাত ও শিল্পজাত কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্য কম খরচে, নিরাপদে ও সহজে রেলপথে পরিবহন করা যায়।
৩. প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়) সময় জরুরি ত্রাণ সরবরাহে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও কৃষির উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, মাদারিপুর, শরীয়তপুর, মেহেরপুর অঞ্চলে কোনো রেলপথ নেই। উক্ত অঞ্চলগুলোতে রেল যোগাযোগ না থাকার ভৌগোলিক কারণসমূহ বের করুন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলপথ একটি পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল এবং যাত্রী পরিবহনের নির্ভরশীল মাধ্যম। প্রধান তিন প্রকার রেললাইনের দৈর্ঘ্য সর্বমোট ২,৮৭৭ কিলোমিটার। তার মধ্যে ব্রড গেজ ৬৫৯ কি. মি. এবং মিটারগেজ রেলপথের পরিমাণ ১,৮০৮ কিলোমিটার। ঢাকা থেকে বাংলাদেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে রেল যোগে যাতায়াত করা যায়। বাংলাদেশ সর্বমোট ৪৪৩টি রেল স্টেশন রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিম্নের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রহিম এবং করিম গ্রীষ্মের ছুটিতে তাদের দাদার বাড়ী বেড়াতে যান। রহিম যান খুলনায় এবং করিম যায় চট্টগ্রামে। উভয়েই পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ ও সুলভ যাতায়াত মাধ্যম হিসেবে রেলপথ বেছে নিয়েছেন।

১. খুলনায় কোন ধরনের রেলপথ রয়েছে?
   ক) ব্রডগেজ খ) মিটারগেজ
   গ) ব্রডগেজ ও মিটারগেজ ঘ) কোনটি নয়
২. চট্টগ্রামে কোন ধরনের রেলপথ রয়েছে?
   ক) ব্রডগেজ খ) মিটারগেজ
   গ) ব্রডগেজ ও মিটারগেজ ঘ) কোনটি নয়
৩. ব্রডগেজ রেলপথের প্রস্থ কত?
   ক. ১.৫৮ মিটার প্রস্থ খ. ১.৪৮ মিটার প্রস্থ
   গ. ১.৬৮ মিটার প্রস্থ ঘ. ১.৩৮ মিটার প্রস্থ
৪. বাংলাদেশের মিটারগেজে রেলপথের পরিমাণ কত?
   ক. ১,৮০৮ কিলোমিটার খ. ১,৯০৮ কিলোমিটার
   গ. ১,৪০৮ কিলোমিটার ঘ. ১,৫০৮ কিলোমিটার
৫. মিটারগেজ রেলপথের প্রস্থ কত?
   ক) ২ মিটার খ) ৩ মিটার
   গ) ১ মিটার ঘ) ১.৫ মিটার

পাঠ-১১.৩ নদীপথ (River Transport)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- □বাংলাদেশের নদীপথের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- □নদীপথের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	নদীপথ, নদীবন্দর।

নদীপথ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীসমূহ দেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে আছে। ফলে ভৌগোলিক গঠন অনুসারে নদীপথ গুলোও জালের মতো ছড়িয়ে আছে (চিত্র-১১.৩.১)। বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০টি। উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশের নদীগুলোর মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার এবং নদীপথের দৈর্ঘ্য ৮,৪০০ কিলোমিটার যা অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ নামে পরিচিত। অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের মধ্যে ৫৪০০ কিলোমিটার নদীপথ সারাবছর নৌ চলাচলের জন্য উপযুক্ত। অবশিষ্ট ৩,০০০ কিলোমিটার শুধুমাত্র বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়।

নদীপথের বৈশিষ্ট্য

১. বাংলাদেশের যে সকল নিম্নভূমি সহজে বন্যা কবলিত হয় এবং সেখানে রেলপথ গড়ে উঠে নাই সেখানে নদীপথই প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা। যেমন- সিলেট অঞ্চলের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলে ফরিদপুর, ভোলা, মাদারিপুর ও বরিশাল অঞ্চলে নদীপথই প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা। এখানে কোনো রেলপথ নেই। সড়কপথ রয়েছে সামান্য পরিমাণে।

২. বাংলাদেশের নদীপথে দেশীয় ছোট ছোট নৌকা হতে আরম্ভ করে লঞ্চ, স্টিমার, নৌট্রাক, পণ্য ও যাত্রিবাহী জলযান চলাচল করে। বাংলাদেশে মোট লঞ্চঘাটের সংখ্যা ৩৭৬টি এবং ফেরিঘাটের সংখ্যা ৩৪টি (অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ২০১৩)।

৩. বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নদীপথ পরিবহনের সামগ্রিক অবস্থা নিম্নরূপ :

সাল	অভ্যন্তরীণ নদীপরিবহনের আয় (কোটি টাকায়)
২০০৮-০৯	১৭১.৭১
২০০৯-১০	২০০.১৩
২০১০-১১	২১১.৯৮
২০১১-১২	২২৫.৯৯
২০১২-১৩	১৩১.৭৫

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৩

৪. বাংলাদেশের নদীবন্দরসমূহের মধ্যে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল, খুলনা, ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, আরিচা, আজমিরীগঞ্জ ও মাদারিপুর, উল্লেখযোগ্য (চিত্র- ১১.৩.১)।

৫. বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌচলাচলের জন্য বেশি উপযোগী।

৬. প্রতি বছর পলিমাটি জমে বাংলাদেশের নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে চরের সৃষ্টি হয়, ফলে নৌ চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

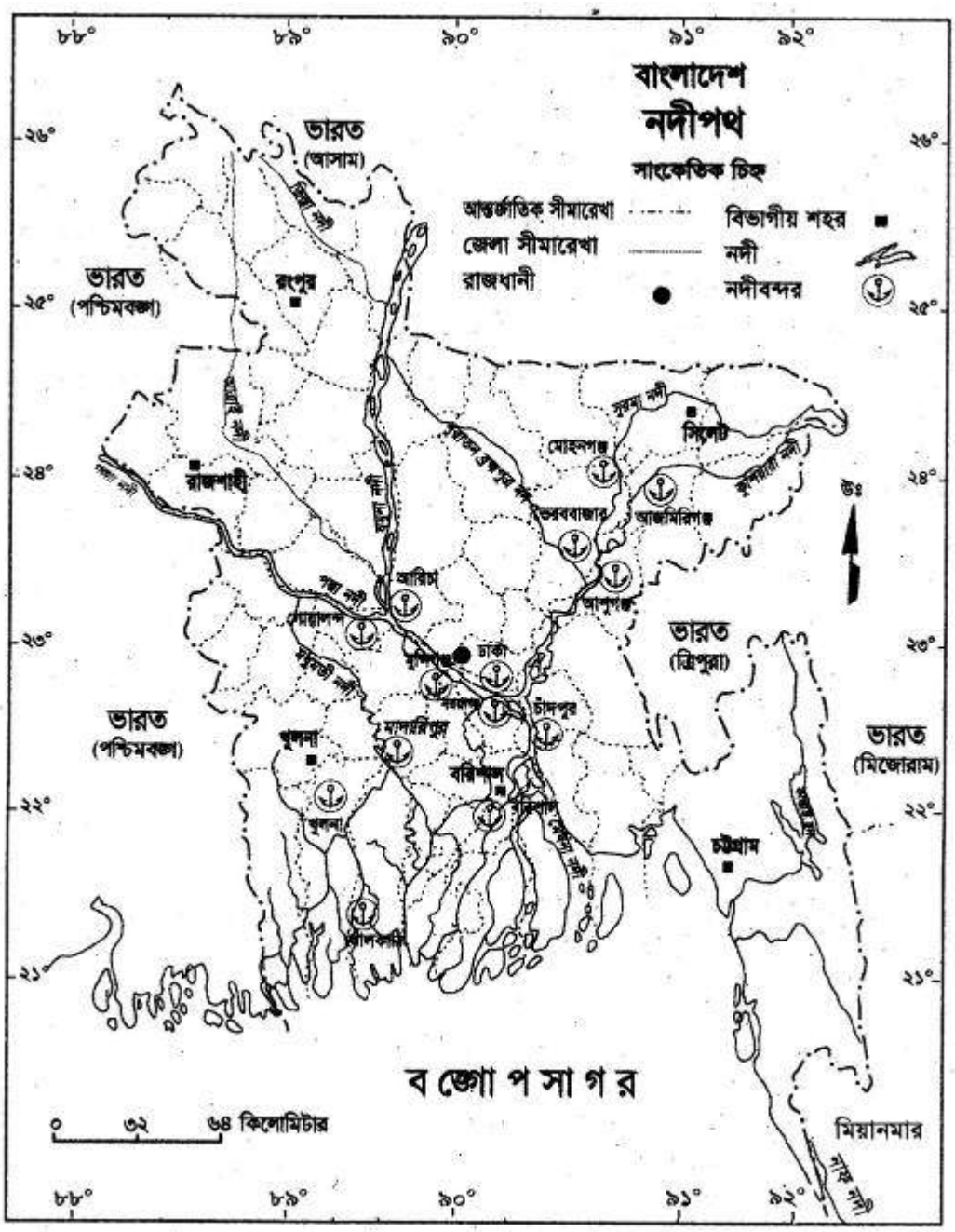

চিত্র ১১.৩.১ বাংলাদেশের নদীপথ

নদীপথের সমস্যসমূহ

১. **নদীভরাট :** বাংলাদেশের নদীগুলোর তলদেশে প্রতি বছর পলিমাটি জমা হয়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদীতে চর সৃষ্টি হয় এবং নৌযান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

২. **নৌ দুর্ঘটনা :** প্রয়োজনের তুলনায় নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, ফেরী ইত্যাদির সংখ্যা কম হওয়ায় অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনায় পড়ে।

৩. **উপযুক্ত ঘাট ও জেটির অভাব :** বাংলাদেশের নদীপথে উপযুক্ত ঘাট ও জেটি নেই বললেই চলে, ফলে যাত্রী ও মালামাল উঠানামায় বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

৪. **দক্ষ চালকের অভাব :** বাংলাদশের প্রায় লঞ্চ দুঘর্টনা ঘটে দক্ষ চালকের অভাবে।

৫. **সংকেত ব্যবস্থার অভাব :** বাংলাদশের নদীপথে প্রয়োজনীয় সংকেত ব্যবস্থা নেই। ফলে রাতের বেলায় লঞ্চ ও স্টিমার চলাচলের অসুবিধা হয়।

এছাড়া ধীরগতিসম্পন্ন জলযান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাব, জলযান প্রস্তুত ও মেরামত কারখানার অভাব, মূলধনের অভাব প্রভৃতি বাংলাদেশের নৌ যোগাযোগের পথে অন্যতম অন্তরায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	"নদীপথ সাশ্রয়ী পথ" ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ :

ভৌগোলিক গঠন অনুসারে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীপথগুলো জালের মতো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশের নদীগুলোর মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায় ২২,১৫৫ কি.মি.। নদীপথের দৈর্ঘ্য মোট ৮,৪০০ কি.মি. তন্মধ্যে ৫,৪০০ কিলোমিটার নদীপথ সারাবছর নৌ-চলাচলের উপযোগী। অবশিষ্ট ৩০০০ কিলোমিটার শুধুমাত্র বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের নদীপথে দেশীয় ছোট ছোট নৌকা থেকে শুরু করে লঞ্চ, স্টিমার পণ্য ও যাত্রিবাহী জলযান চলাচল করে। বাংলাদেশে মোট ফেরীঘাটের সংখ্যা ৩৪টি এবং লঞ্চঘাটের সংখ্যা ৩৭৬টি। অভ্যন্তরীণ নদীপথগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নদীপথ পরিবহণের মোট আয় ১৩১.৭৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশের নদীপথের প্রধান সমস্যাসমূহ হলো নদীভরাট, জলযানের অভাব, উপযুক্ত ঘাট ও জেটির অভাব ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নদীপথের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন-

i)নিম্নভূমি ও সহজে বন্যা কবলিত হয় এমন অঞ্চলে নদীপথ প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা

ii) বাংলাদেশে নদী প্রবন এলাকায় বর্ষাকালে নদীপথেই প্রধান যাতায়াত মাধ্যম।

iii) বাংলাদেশে মোট ফেরিঘাটের সংখ্যা ৩৪টি।

নিম্নের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) i, ii ও iii ঘ) ii ও iii

২. বাংলাদেশের নদীপথের মোট দৈর্ঘ্য কত?

ক. ৮০০০ কিলোমিটার খ. ৮,২০০ কিলোমিটার

গ. ৮,৪০০ কিলোমিটার ঘ. ৮,১০০ কিলোমিটার

৩. সারা বছর নৌ চলাচলের উপযোগী নদীপথ কত কিলোমিটার?

ক. ৫,৪০০ কিলোমিটার খ. ৫,২০০ কিলোমিটার

গ. ৪,৪০০ কিলোমিটার ঘ. ৫,০০০ কিলোমিটার

পাঠ-১১.৪ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Internal Trade)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন এবং
- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত পণ্যসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

মানুষের চাহিদা ও চাহিদা পূরণের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর সাথে আনুষাঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য। এই আদান-প্রদান একই এলাকায়, একই দেশের দুই বা ততোধিক অঞ্চলের মধ্যে এবং একদেশের সাথে অন্যদেশের হতে পারে। তাই বাণিজ্যকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা :

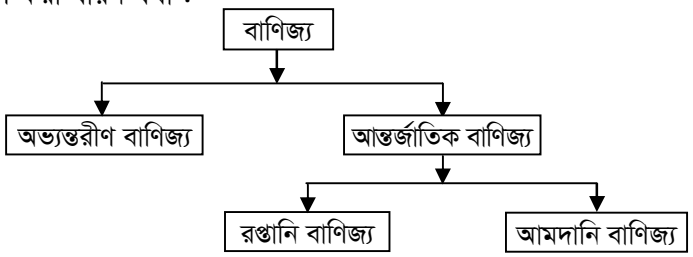

দেশের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন-আমাদের দেশে সিলেটের পাথর সিলেট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী সারাদেশে বিক্রয় করা হয়। উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে চাহিদাপূর্ণ এলাকায় পণ্যদ্রব্য সরবরাহের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্য ও দ্রব্যমূল্যের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত গ্রাম বা হাট থেকে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় এবং উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য জেলা, সদর, গঞ্জে বন্টন করা হয়। এই বাজার বা বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো প্রধানত চার ধরনের হয়। যথা:

১. **প্রাথমিক বাণিজ্য কেন্দ্র বা হাট :** বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের যেখানে সপ্তাহে এক, দুই বা তিন দিন সকাল থেকে রাত ৯টা/১০টা যেখানে অস্থায়ী কেনা বেচা কেন্দ্র দেখা যায়, তাকে হাট বলে। হাটগুলোতে মূলত কৃষকের উদ্বৃত্ত বেচাকেনা হয়। এই হাটগুলো প্রাথমিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমগ্র কাঠামো তৈরি করছে। উৎপাদনকারী বা কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত দ্রব্যগুলো জেলা শহরে অবস্থিত দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজারে প্রেরণ করার মাধ্যমে দেশের চাহিদাপূর্ণ অন্যান্য এলাকায় সরবরাহ করে।

২. **দ্বিতীয় পর্যায়ের বাণিজ্য কেন্দ্র বা পাইকারি বাজার :** দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজারে সরবরাহকৃত পণ্য সারাদেশের প্রাত্যহিক বাজারগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। সপ্তাহে এক বা দুই বার অনুষ্ঠিত হাটের দিন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ধান, গম, ডাল, পাট, তুলা, প্রভৃতি পণ্য দুই এক সপ্তাহের জন্য গুদামে রেখে অন্যান্য চাহিদাপূর্ণ বাজারে প্রেরণ করা হয়। ঢাকার শ্যামবাজার, কাওরান বাজার, দ্বিতীয় পর্যায়ের বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

৩. **সংগ্রহ কেন্দ্র :** পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা খুচরা বাজারগুলোতে সরবরাহ করা সংগ্রহ কেন্দ্রের কাজ। যেমন- মুন্সিগঞ্জ জেলার মীরকাদিম ডাল, কলা, আলু, আদা, মরিচ প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যের সংগ্রহ কেন্দ্র,

পদ্মা নদীর বাম তীরে অবস্থিত তারপাশা মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র, চন্দা নদীর তীরে অবস্থিত পাংশা পাট ও ধানের সংগ্রহ কেন্দ্র এবং নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ ধান, ডাল ও মাছ সংগ্রহ কেন্দ্র। এভাবে সারাদেশে অসংখ্য সংগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে।

৪. **সাময়িক বাণিজ্য কেন্দ্র বা গ্রাম্য মেলা :** বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা গ্রামগুলোতে বছরে দুই বা তিন বার মেলার আয়োজন করা হয়। সাধারণত ধর্মীয় উৎসব, পহেলা বৈশাখ, চৈত্র সংক্রান্তি বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এ রকম মেলা বসে। গ্রাম্য মেলাগুলো সাময়িক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের চাহিদা ও ভোগের সমন্বয় ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাংলাদেশে যাতায়াত ব্যবস্থা (সড়ক পথ, রেলপথ ও নদীপথ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই পথগুলো বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার বাজারসমূহে কোন কোন পণ্য অন্য অঞ্চল হতে আসে এবং কোন কোন দ্রব্য বা পণ্য অন্য অঞ্চলে বিক্রি হচ্ছে তার তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ :

মানুষের চাহিদা এবং চাহিদা পূরণের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে, অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য। এই আদান-প্রদান একই এলাকায় একই দেশের মধ্যে দুটি বা একাধিক অঞ্চলের মধ্যে হতে পারে। অর্থাৎ দেশের ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো প্রধানত চার ধরনের হয় যথা : ১। প্রাথমিক বাণিজ্য কেন্দ্র বা হাট, ২। দ্বিতীয় পর্যায়ের বাণিজ্য কেন্দ্র বা পাইকারি বাজার ৩। সংগ্রহ কেন্দ্র ৪। সাময়িক বাণিজ্য কেন্দ্র বা গ্রাম্য মেলা। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের চাহিদা ও ভোগের সমন্বয় ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সড়কপথ, রেলপথ ও নদীপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার মীরকাদিম ডাল, কলা, আলু, আদা,মরিচ, প্রভৃতির কৃষিজাত পণ্য সংগ্রহ করে। অপরদিকে পদ্মা নদীর বাম তীরে অবস্থিত এলাকা মৎস সংগ্রহ করে এবং পাংশা ধান ও পাট সংগ্রহ করে।

১. মীরকাদিম ও পাংশা কোন ধরনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্র?
   ক) হাট খ) সংগ্রহ কেন্দ্র
   গ) সাময়িক বাণিজ্য কেন্দ্র ঘ) প্রাথমিক বাণিজ্য কেন্দ্র

২. পদ্মা নদীর বামতীরে অবস্থিত সংগ্রহ কেন্দ্রটির নাম কী
   ক) তারপাশা খ) পাংশা
   গ) মীরকাদিম ঘ) মেঘনা

৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্র কত ধরনের?
   ক. ৪ ধরনের খ. ৫ ধরনের
   গ. ৬ ধরনের ঘ. ৭ ধরনের

৪. বাংলাদেশের হাটগুলো কোন ধরনের বাণিজ্য কেন্দ্র?
   ক. দ্বিতীয় পর্যায়ের বাণিজ্য কেন্দ্র খ. প্রাথমিক পর্যায়ের বাণিজ্য কেন্দ্র
   গ. তৃতীয় পর্যায়ের বাণিজ্য কেন্দ্র গ. চতুর্থ পর্যায়ের বাণিজ্য কেন্দ্র

পাঠ-১১.৫ বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	বৈদেশিক বাণিজ্য ।

বৈদেশিক বাণিজ্য

পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং এর সাথে সম্পৃক্ত আনুষাঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য। বাণিজ্য যখন নিজ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। অপরদিকে এক দেশের সাথে অন্যদেশের মধ্যকার বাণিজ্যকে বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। নিজ দেশের উদ্বৃত্ত কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য অন্যদেশে রপ্তানি এবং চাহিদা অনুসারে অন্য সব দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য আমদানি করার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। সারণি ১১.৫.১ এ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য দেখানো হলো।

সারণি- ১১.৫.১ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছর বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্য	পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
রপ্তানি আয়	২৪,৬৫৪
আমদানি ব্যয়	২৯,৭৭৪
বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য	১,৫১৭

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৪

বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

পূর্বে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পভিত্তিক কাঁচামাল রপ্তানি। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের অবদান শতকরা ৪১.৫ এবং নীটওয়্যার এর অবদান শতকরা ৩৮.৮। অর্থাৎ মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ আসে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রাথমিক পণ্য থেকে রপ্তানি আয় কমেছে এবং শিল্পজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় বেড়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট রপ্তানিতে প্রাথমিক পণ্যের অবদান ৪.৫ শতাংশ। অপরদিকে শিল্পজাত পণ্যের অবদান ৯৫.৫ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪)। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রপ্তানি দ্রব্যের চেয়ে আমদানি দ্রব্য বেশি। এ সকল বৈদেশিক বাণিজ্য চলে সমুদ্রপথে। তবে জরুরি প্রয়োজনে, পচনশীল দ্রব্য আকাশপথে আমদানি-রপ্তানি করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সঠিক সময়ে পণ্য প্রেরণ, পণ্যের গুণাগুন ঠিক রাখা, ব্যাপক প্রচার ও রপ্তানি শুল্ক হ্রাস প্রভৃতি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

দেশভিত্তিক পণ্য আমদানি : দেশভিত্তিক পণ্য আমদানিতে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে চীন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ১৯.০ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৭ শতাংশ) ও সিংগাপুর (৬.০ শতাংশ) (সারণি-১১.৫.২)।

সারণি ১১.৫.২: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশের নাম	২০১২-১৩ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২০১৩-১৪ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
চীন	৬৩২৪	৩৫৬৯
ভারত	৪৭৭৭	২৫৬৫
সিংগাপুর	১৪২২	১১২৩
যুক্তরাষ্ট্র	৫৩৮	৩১৭
মালয়েশিয়া	১০৯৩	৯৪৫
জাপান	১১৮০	৫১৩

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪

দেশভিত্তিক রপ্তানি : বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রমে সর্বাধিক বাংলাদেশী পণ্য আমদানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করে দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম (সারণি ১১.৫.৩)।

সারণি : ১১.৫.৩ বাংলাদেশে দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

দেশের নাম	২০১২-১৩ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২০১৩-১৪ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র	৫৪১৯.৬০	২৭৯০.৮৬
জার্মানি	৩৯.৬২৬০	২৩৪১.৫৭
যুক্তরাজ্য	২৭৬৪.৯০	১৯৬৯.৩৩
ফ্রান্স	১৫১০.৮০	৮২৭.০৫
বেলজিয়াম	৭৩০.৮১	৪৭৪.৯৮

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু পর্যাপ্ত মূলধন ও উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রায়ই অসম্ভব ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যকার ভারসাম্য থাকছে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনপূর্বক প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ :

নিজ দেশের উদ্বৃত্ত কৃষিজাত ও শিল্পজাতদ্রব্য অন্যদেশে রপ্তানি এবং চাহিদা অনুসারে অন্য দেশের পণ্য আমদানি করার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য ১,৫১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্বে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পভিত্তিক কাঁচামাল রপ্তানি। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ আসে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে। বাংলাদেশে রপ্তানি দ্রব্যের চেয়ে আমদানী দ্রব্য বেশী। এ সকল বৈদেশিক বাণিজ্য চলে সমুদ্র পথে। তবে জরুরি প্রয়োজনের পচনশীল দ্রব্য আকাশ পথে আমদানি রপ্তানি করা হয়। সর্বাধিক পণ্য রপ্তানি করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। অপরদিকে সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে চীন থেকে, যা মোট আমদানি ব্যায়ের ১৯ শতাংশ। পণ্য আমদানিতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত ও সিংগাপুর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ লক্ষ্য করুন-

i) বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রপ্তানি দ্রব্যের চেয়ে আমদানি দ্রব্য বেশি

ii) বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য ১৫১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

iii) বাংলাদেশ সর্বাধিক পণ্য আমদানী করে চীন থেকে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২. বাংলাদেশ সর্বাধিক পণ্য রপ্তানি করে কোন দেশে?

ক. যুক্তরাষ্ট্রে খ. ফ্রান্সে গ. চীনে ঘ. জার্মানীতে

৩. বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা কতভাগ আসে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে?

ক. প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ খ. প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ গ. প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ঘ. প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ

পাঠ-১১.৬ আমদানি ও রপ্তানি পণ্য (Import and Export Products)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	আমদানি ও রপ্তানি পণ্য।

আমদানি ও রপ্তানি পণ্য

আমদানি পণ্য (Import Products) : বাংলাদেশের আমদানিকৃত দ্রব্যসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১। প্রাথমিক আমদানি দ্রব্যসমূহ

২। শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যসমূহ

১। **প্রাথমিক আমদানি দ্রব্যসমূহ :** প্রধান প্রাথমিক আমদানি দ্রব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে চাল, গম, তেলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, তুলা প্রভৃতি। নিম্নের সারণিতে (১১.৬.১) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহের আমদানি ব্যয় দেখানো হলো।

সারণি ১১.৬.১: প্রাথমিক দ্রব্যসমূহের আমদানি ব্যয়

প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	আমদানি ব্যায় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
চাল	৩০	২৮৭৭
গম	৬৯৬	১২৬
তৈলবীজ	২৪২	৬৮২
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১১০২	২৬৩
তুলা	২০০৫	৪৮৩

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪

২। **শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যসমূহ :** প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে ভোজ্য তেল, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী, সার, ফ্লিংকার স্টেপল ফাইবার ও সুতা। সারণি- ১১.৬.২ প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের আমদানি ব্যয় দেখানো হলো-

সারণি ১১.৬.২ : প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের আমদানি ব্যয়

প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	২০১২-১৩ আমদানি ব্যায় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২০১৩-১৪ আমদানি ব্যায় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
ভোজ্য তেল	১৪০২	১০৩৩
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী	৩৬৪২	২১৬৯
সার	১১৮৮	৭৪০
ফ্লিংকার	৪৮৭	৩২৯
স্টেপল ফাইবার	৪৫৪	২৬৬
সুতা	১৫৩৬	৮৩৩

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪

বাংলাদেশের পণ্যসমূহ প্রধানত ভারত, চীন, সিঙ্গাপুর, জাপান, হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে চীন। মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ১৯.০ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে চীন থেকে পণ্য আমদানি বাবদ। পণ্য আমদানিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৭ শতাংশ) ও সিংগাপুর (৬.০ শতাংশ)।

রপ্তানি পণ্য (Export Products) : বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহকেও মোট দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা- প্রাথমিক রপ্তানি পণ্য ও শিল্পজাতপণ্য। মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৯৫.২ ভাগ আসে শিল্পজাত পণ্য থেকে অপরদিকে প্রাথমিক পণ্য থেকে আসে মাত্র শতকরা ৪.৮ ভাগ (সারণি ১১.৬.৩)।

প্রাথমিক রপ্তানি পণ্য : প্রাথমিক পণ্যের মধ্যে রয়েছে হিমায়িত খাদ্য, চা, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচাপাট ও অন্যান্য।

শিল্পজাত পণ্য : শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, চামড়া ও পাটজাতপণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, পাদুকা ও হস্তজাত শিল্প। বাংলাদেশে সর্বাধিক রপ্তানি আয় হয় তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার থেকে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার থেকে রপ্তানি আয় হয়েছিল শতকরা ৮১.৪ ভাগ। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি আয়ের শতকরা অবদান দেখানো হলো-

সারনি ১১.৬.৩ পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকার হার

শিল্পজাত পণ্যসমূহ	২০১২-১৩ (রপ্তানি আয়)	২০১৩-১৪ (রপ্তানি আয়)
তৈরি পোশাক	৪০.৮	৪১.৫
নীটওয়্যার	৩৮.৮	৩৯.৯
চামড়া	১.৫	১.৭
পাটজাতপণ্য	৩.০	২.৩
রাসায়নিক দ্রব্য	০.৩	০.৩
পাদুকা	১.৬	১.৯
প্রকৌশল সামগ্রী	১.৪	১.২

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪

বাংলাদেশের পণ্য সর্বাধিক রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ যেমন- জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট রপ্তানির শতকরা ১৯.০ শতাংশ রপ্তানি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)।

শিক্ষার্থীর কাজ	রপ্তানি বাড়াতে বাংলাদেশের আর কোন কোন পণ্যের রপ্তানির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন এবং চাহিদার ভিত্তিতে কোন কোন পণ্যের আমদানি বাড়াতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। দলগতভাবে পণ্যসমূহের তালিকা মিলিয়ে চূড়ান্ত তালিকা শিক্ষকের কাছে জমা দিন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের আমদানিকৃত প্রধান দ্রব্যসমূহ হলো গম, তৈলবীজ, তুলা, ভোজ্য তেল, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী, স্টেপল ফাইবার, সুতা প্রভৃতি। অপরদিকে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্যসমূহ হলো চা, কৃষিজাতপণ্য, কাঁচাপাট, তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, চামড়া, পাটজাতদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, পাদুকা প্রভৃতি। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে সর্বাধিক অবদান রাখে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগের অধিক। বর্তমানে বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় অধিক হওয়ার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসমূহকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
   ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
   গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

২. বাংলাদেশ সর্বাধিক পণ্য আমদানি করে কোন দেশ থেকে?
   ক. চীন খ. ভারত
   গ. মালয়েশিয়া ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে বাংলাদেশ কোন দেশে সবচেয়ে বেশি পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে?
   ক. ভারত খ. সিংগাপুর
   গ. জাপান ঘ. জার্মান

৪. রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার এর অবদান শতকরা কত ভাগ?
   ক. ৪১.৫ ভাগ খ. ৮০ ভাগ
   গ. ৮১.৪ ভাগ ঘ. ৮২.৪ ভাগ

৫. মোট রপ্তানির কত শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়?
   ক. ২০ শতাংশ খ. ১৯ শতাংশ
   গ. ১৮ শতাংশ ঘ. ১৭ শতাংশ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আরিন গত গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকা থেকে তার বাবা মার সাথে কক্সবাজার বেড়াতে যায়। আকাশপথে ভ্রমণ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে তারা কম খরচে একটি পথ বেছে নিয়েছিলো।

(ক) আকাশ পথ ব্যতীত স্বল্প খরচে যোগাযোগ পথের নাম কী?

(খ) বাংলাদেশে যাতায়াত ব্যবস্থা কত প্রকার ও কী কী

(গ) বাংলাদেশে ঢাকা কেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ সড়কপথসমূহ কী কী

(ঘ) বাংলাদেশের সড়ক পথের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

উত্তর

(ক) আকাশ পথ ব্যতীত স্বল্প খরচে যোগাযোগ পথের নাম সড়ক পথ।

(খ) বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা: স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ। স্থলপথ দুইপ্রকার। যথা: সড়কপথ ও রেলপথ। জলপথ দুই প্রকার নদীপথ ও সমুদ্র পথ।

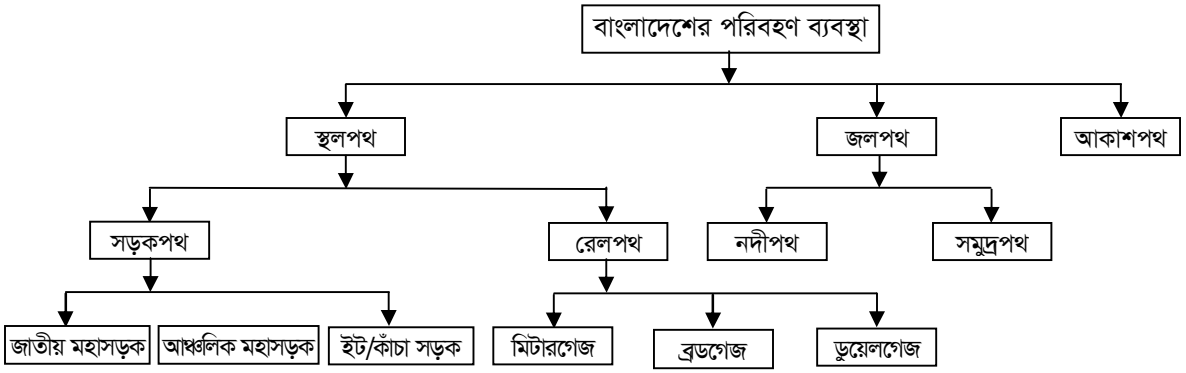

(গ) **অভ্যন্তরীণ প্রধান সড়কপথ :**

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সড়কপথ মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক তাই প্রধান সড়কপথসমূহ নিম্নরূপ। যথা :

৫. ঢাকা ↔ আরিচা নগরবাড়ি হয়ে পাবনা, বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর দিনাজপুর ও তেঁতুলিয়া।

৬. ঢাকা ↔ দৌলতদিয়া হয়ে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল।
৭. ঢাকা ↔ টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
৮. ঢাকা ↔ কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, টেকনাফ।

(ঘ) **সড়কপথের বৈশিষ্ট্য :**

১. সমতলভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে অধিকাংশ সড়কপথ গড়ে উঠেছে।
২. উঁচু-নিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় সড়কপথ নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। একারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলনামূলকভাবে কম সড়কপথ আছে।
৩. শক্ত মৃত্তিকা বা মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তাহলে সড়কপথ বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয় অর্থাৎ সড়কপথ স্থায়ী হয়।
৪. বাংলাদেশে বন্দর ও শিল্পক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সড়কপথ গড়ে উঠে। এজন্য মংলা এবং চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শিল্প অঞ্চলে অধিকাংশ সড়কপথ গড়ে উঠেছে।
৫. ঢালযুক্ত স্থানে সড়কপথ তৈরি করা কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। এতে গাড়ির জ্বালানি খরচ বেশি হয়। অর্থাৎ বেশি ঢাল সড়কপথ তৈরির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ।
৬. বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ অঞ্চলে কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণে খরচ বেশি হয়। এজন্য এসকল অঞ্চলে সড়কপথ কম গড়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশের সিলেটের হাওর অঞ্চল বা দক্ষিণাঞ্চলে সড়কপথ কম।
৭. কাঁচা সড়ক ও আঞ্চলিক সড়কগুলো বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে বৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে সারাবছরই সড়ক মেরামত করতে হয়।
৮. বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করতে হয়, যা সড়কপথের বাধা হিসাবে কাজ করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু এবং ১৩,৭৫১টি কালভার্ট এবং ৩৪টি ফেরিঘাট রয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ও আমদনি ব্যয় নিম্নে দেখানো হলো-

সাল	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন ইউএসডলার)
২০১০-১১	২২,৯২৮.২২	৩৩,৬৫৮
২০১১-১২	২৪,২৮৭.৬৬	৩৫,৫১৬
২০১২-১৩	১২,৫৯৯.৭৩	১৬,৪৪২
২০১৩-১৪	২৪,৬৫৪	২৯,৭৭৪

ক) আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য কাকে বলে?
খ) বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধাজনক পথ কোনটি এবং কেন?
গ) উপরের সারণিতে কোন বছর রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ভারসাম্য সবচেয়ে কম? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উল্লিখিত সারণি বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমদানি ও রপ্তানির ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (ক) ৪. (খ) ৫. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২ : ১. (ক) ২. (খ) ৩. (গ) ৪. (ক) ৫. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩ : ১. (খ) ২. (গ) ৩. (ক) ৪. (ক) ৫. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (ক) ৪. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫ : ১. (ঘ) ২. (ক) ৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬ : ১. (ক) ২. (ক) ৩. (ঘ) ৪. (গ) ৫. (খ)।